আর-রাহীকুল মাখতূম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ তৎকালীন আরবের ভৌগলিক, সামাজিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা (العَرَبُ، الأَرْضُ وَالشَّعْبُ، الحُكْمُ وَالْاِقْتِصَادُ، الدِّيَانَةُ)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী (রহঃ)

আরব সম্প্রদায়সমূহ

জন্মসূত্রের ভিত্তিতে ইতিহাসবিদগণ আরব সম্প্রদায় সমূহকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যথা:

আরবের বায়িদাহ : এরা হল ঐ সমস্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন গোত্র এবং সম্প্রদায় যা ধরাপৃষ্ঠ থেকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং এদের খোঁজ খবর সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রমাণাদির সন্ধান লাভ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এ সম্প্রদায়গুলো হচ্ছে যথাক্রমে আদ, সামূদ, ত্বাসম, জাদীস, ইমলাক্ব, উমাইম, জুরহুম, হাযূর, ওয়াবার, ‘আবীল, জাসিম, হাযারামাওত ইত্যাদি।[1]

আরবে ‘আরিবা : এরা হচ্ছে ঐ সমস্ত গোত্র যারা ইয়াশজুব বিন ইয়া‘রুব বিন ক্বাহত্বানের বংশোদ্ভূত। এদেরকে ক্বাহত্বানী আরব বলা হয়।

আরবে মুস্তা’রিবা : এরা হচ্ছেন ঐ আরব সম্প্রদায় যারা ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধারা থেকে আগত। এদেরকে আদনানী আরব বলা হয়।

আরবে ‘আরিবা অর্থাৎ ক্বাহত্বানী আরবদের প্রকৃত আবাসস্থল ছিল ইয়ামান রাজ্য। এখানেই তাদের বংশধারা এবং গোত্রসমূহ সাবা বিন ইয়াশযুব বিন ইয়া‘রুব বিন ক্বাহত্বান এর বংশধর থেকে বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর মধ্যে পরবর্তীকালে দু’গোত্রই অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। সেগুলো হল : হিমইয়ার বিন সাবা ও কাহলান বিন সাবা। বনী সাবা’র আরো এগারটি বা চৌদ্দটি গোত্র ছিল যাদেরকে সাবিউন বলা হতো। সাবা ব্যতীত তাদের আর কোনো গোত্রের অস্তিত্ব নেই।

(ক) হিমইয়ার : এর প্রসিদ্ধ শাখাগুলো হচ্ছে-

(১) কুযা’আহ : এর প্রশাখাসমূহ হল বাহরা, বালী, আলক্বায়ন, কালব, উযরাহ ও ওয়াবারাহ।

(২) সাকাসিক : তারা হলেন যায়দ বিন ওয়ায়িলাহ বিন হিমইয়ার এর বংশধর। যায়দ এর উপাধি হল সাকাসিক। তারা বনী কাহলানের ‘সাকাসিক কিন্দাহ’র অন্তর্ভুক্ত নয় যাদের আলোচনা সামনে আসছে।

(৩) যায়দুল জামহুর : এর প্রশাখা হল হিমইয়ারুল আসগার, সাবা আল-আসগার, হাযূর ও যূ আসবাহ।

(খ) কাহলান : এর প্রসিদ্ধ শাখা-প্রশাখাগুলো হচ্ছে হামদান, আলহান, আশ’য়ার, ত্বাই, মাযহিজ (মাযহিজ থেকে আনস ও আন্ নাখ‘, লাখম (লাখম হতে কিন্দাহ, কিন্দাহ হতে বনু মুআ‘বিয়াহ, সাকূন ও সাকাসিক), জুযাম, আ‘মিলাহ, খাওলান, মাআ‘ফির, আনমার (আনমার থেকে খাসয়াম ও বাখীলাহ, বাখীলাহ থেকে আহমাস) আযদ (আযদ থেকে আউস, খাজরায, খুযা’আহ এবং জাফরান বংশধরগণ। এঁরা পরে শাম রাজ্যের আশেপাশে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং আলে গাসসান নামে প্রসিদ্ধ লাভ করেন।

অধিকাংশ কাহলানী গোত্র পরে ইয়ামান রাজ্য পরিত্যাগ করে আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণভাবে তাদের দেশত্যাগের ঘটনা ঘটে 'সাইলে আরিমের' কিছু পূর্বে। ঐ সময়ের ঘটনা, যখন রোমীয়গণ মিশর ও শামে অনুপ্রবেশ করে ইয়েমেরনর অধিবাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্যের জলপথের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে এবং স্থলপথের যাবতীয় সুযোগ সুবিধারও চিরতরে অবসান ঘটে। এর ফলে কাহলানীদের ব্যবসা-বাণিজ্য একদম উজাড় হয়ে যায়। যার সাক্ষ্য পবিত্র কুরআনে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

(لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِيْ مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِيْنٍ وَّشِمَالٍ كُلُوْا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ فَأَعْرَضُوْا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ ذٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوْا وَهَلْ نُجَازِيْ إِلَّا الْكَفُوْرَ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرٰى الَّتِيْ بَارَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِيْنَ فَقَالُوْا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوْا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيْثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ) [سورة سبأ:15 : 19]

"সাবার অধিবাসীদের জন্য তাদের বাসভূমিতে একটা নিদর্শন ছিল- দু'টো বাগান; একটা ডানে, একটা বামে। (তাদেরকে বলেছিলাম) তোমাদের প্রতিপালক প্রদত্ত রিযক ভোগ কর আর তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। সুখ-শান্তির শহর আর ক্ষমাশীল পালনকর্তা। কিন্তু তারা (আল্লাহ হতে) মুখ ফিরিয়ে নিল। কাজেই আমি তাদের বিরুদ্ধে পাঠালাম বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যা, আর আমি তাদের বাগান দু'টিকে পরিবর্তিত করে দিলাম এমন দু'টি বাগানে যাতে জন্মিত বিস্বাদ ফল, ঝাউগাছ আর কিছু কুল গাছ। অকৃতজ্ঞতাভরে তাদের সত্য প্রত্যাখ্যান করার জন্য আমি তাদেরকে এ শাস্তি দিয়েছিলাম। আমি অকৃতজ্ঞদের ছাড়া এমন শাস্তি কাউকে দেই না। তাদের এবং যে সব জনপদের প্রতি আমি অনুগ্রহ বর্ষণ করেছিলাম সেগুলোর মাঝে অনেক দৃশ্যমান জনপদ স্থাপন করে দিয়েছিলাম এবং ওগুলোর মাঝে সমান সমান দূরত্বে সফর মনযিল করে দিয়েছিলাম। (আর তাদেরকে বলেছিলাম) তোমরা এ সব জনপদে রাতে আর দিনে নিরাপদে ভ্রমণ কর। কিন্তু তারা বলল- হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের সফর-মঞ্জিলগুলোর মাঝে ব্যবধান বাড়িয়ে দাও। তারা নিজেদের প্রতি যুলম করেছিল। কাজেই আমি তাদেরকে কাহিনী বানিয়ে ছাড়লাম (যে কাহিনী শোনানো হয়) আর তাদেরকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিলাম। এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে। (সূরাহ সাবা : ১৫-১৯)

হিমইয়ারী ও কাহলানী গোত্রদ্বয়ের বংশদ্বয়ের মধ্যে বিরাজমান আত্মকলহ ও দ্বন্দ্ব ছিল তাদের অন্যতম প্রধান কারণ। যার ইঙ্গিত বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া যায়। এ সকল সূত্র থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, আত্মকলহের কারণে জীবন যাত্রার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানাবিধ জটিল সমস্যার উদ্ভব হওয়ায় কাহলানী গোত্রসমূহ স্বদেশভূমির মায়া-মমতা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়, কিন্তু হিমইয়ারী গোত্রসমূহ স্বস্থানে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে।

যে সকল কাহলানী গোত্র স্বদেশের মায়া-মমতা কাটিয়ে অন্যত্র গমন করে তাদের চারটি শাখায় বিভক্ত হওয়ার কথা নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায় :

১। আযদ : এরা নিজ নেতা ইমরান বিন 'আমর মুযাইকিয়ার পরামর্শানুক্রমে দেশত্যাগ করেন। প্রথম দিকে এঁরা ইয়ামানের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করতে থাকেন। তাঁদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাত্রার প্রাক্কালে নিরাপত্তার ব্যাপারে সুনিশ্চিত হওয়ার জন্য অগ্রভাগে অনুসন্ধানী প্রহরীদল প্রেরণ করতেন। এভাবে পথ পরিক্রমা করতে করতে তাঁরা অবশেষে উত্তর ও পূর্বমুখে অগ্রসর হওয়ার এক পর্যায়ে বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েন এবং এখানে-সেখানে পরিভ্রমণ করতে করতে বিভিন্ন স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করে নেন। তাঁদের এ

দেশান্তর এবং বসতি স্থাপন সংক্রান্ত বিবরণ নিম্নরূপ :

ইমরান বিন ‘আমর : তিনি উমানে গমন করেন এবং তার গোত্র সেখানেই বসবাস করেন। এঁরা হলেন আযদে উমান।

নাসর বিন আযদ : বনু নাসর বিন আযদ তুহামায় বসতি স্থাপন করেন। এঁরা হলেন আযদে শানুয়াহ।

সা‘লাবাহ বিন ‘‘আমর : তিনি প্রথমত হিজায অভিমুখে অগ্রসর হয়ে সা‘লাবিয়া ও যূ ক্বার নামক স্থানের মধ্যস্থানে বাসস্থান নির্মাণ করে বসবাস করতে থাকেন। যখন তাঁর সন্তান সন্ততি বয়োঃপ্রাপ্ত হন এবং বংশধরগণ শক্তিশালী হয়ে উঠেন তখন মদীনা অভিমুখে অগ্রসর হয়ে মদীনাকেই বসবাসের জন্য উপযুক্ত স্থান মনে করে সেখানে বসতি স্থাপন করেন। ঐ সা‘লাবাহর বংশধারা থেকেই উদ্ভব হয়েছিল আউস এবং খাযরাজ গোত্রের তথা মদীনার আনসারদের।

হারিসাহ বিন ‘‘আমর : অর্থাৎ খুযা’আহ এবং তাঁর সন্তানাদি। এঁরা হিজায ভূমিতে চক্রাকারে ইতস্তত পরিভ্রমণ করতে করতে মার্রুয যাহরান নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে বসবাস করতে থাকেন। তারপর হারাম শরীফের উপর প্রবল আক্রমণ পরিচালনা করে বানু জুরহুমকে সেখান থেকে বহিস্কার করেন এবং নিজেরা মক্কাধামে স্থায়ী বসতি স্থাপন করে বসবাস করতে থাকেন।

‘ইমরান বিন ‘‘আমর : তিনি এবং তাঁর সন্তানাদি ‘আম্মানে’ বসতি স্থাপন করেছিলেন। তাই তাঁদেরকে ‘আযাদে আম্মান’ বলা হতো।

নাসর বিন ‘আমর : এঁর সঙ্গে সম্পর্কিত গোত্রগুলো তুহামায় বসতি স্থাপন করেছিলেন। এঁদেরকে ‘আযাদে শানুআহ’ বলা হতো।

জাফনা বিন ‘‘আমর : তিনি শাম রাজ্যে গমন করে সেখানে বসতি স্থাপন করেন এবং সন্তানাদিসহ বসবাস করতে থাকেন। তিনি হচ্ছেন গাসসানী শাসকগণের প্রখ্যাত পূর্ব পুরুষ। শাম রাজ্যে গমনের পূর্বে হিজাযে গাসসান নামক ঝর্ণার ধারে তাঁরা কিছুদিন বসবাস করেছিলেন, তাই তাঁদের বংশধারাকে গাসসানী বংশ বলা হতো। কিছু ছোট ছোট গোত্র হিজাজ ও শামে হিজরত করে ঐ সকল গোত্রের সাথে মিলিত হয়। যেমন কা‘ব বিন ‘আমর, হারিস বিন ‘আমর ও আউফ বিন ‘আমর।

২। লাখম ও জুযাম গোত্র : তারা পূর্ব ও উত্তর দিকে গমন করে। এ লাখমীদের মধ্যে নাসর বিন রাবী’আহ নামক এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি হীরাহর মুনাযিরাহ বংশের শাসকগণের অত্যন্ত প্রভাবশালী পূর্বপুরুষ ছিলেন।

৩। বানু ত্বাই গোত্র : এ গোত্র বানু আযদ গোত্রের দেশ ত্যাগের পর উত্তর অভিমুখে অগ্রসর হয়ে আযা’ এবং সালামাহ দু’পাহাড়ের পাদদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। এ গোত্রের নামানুসারে পাহাড় দুটি ‘বানু ত্বাই’ গোত্রের নামে পরিচিতি লাভ করে।

৪। কিন্দাহ গোত্র : এ গোত্র সর্বপ্রথম বাহরাইনে বর্তমান আল আহসায় শিবির স্থাপন করেন। কিন্তু সেখানে আশানুরূপ পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা না পাওয়ায় বাধ্য হয়ে ‘হাযরামাওত’ অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু সেখানেও তেমন কোন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে না পারায় অবশেষে নাযদ অঞ্চলে গিয়ে বসতি গড়ে তোলেন। সেখানে তাঁরা একটি অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ বিশাল রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন। কিন্তু সে রাষ্ট্র বেশী দিন স্থায়ী হয় নি, অল্প কালের মধ্যেই তার অস্তিত্ব চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

কাহলান ব্যতিত হিময়ারেরও অনুরূপ একটি কুযা'আহ গোত্র রয়েছে। অবশ্য যাঁরা ইয়ামান হতে বাস্তুভিটা ত্যাগ করে ইরাক সীমান্তে বসতি স্থাপন করেন তাঁদের হিময়ারী হওয়ার ব্যাপারেও কিছুটা মতভেদ রয়েছে। এদের কিছু গোত্র সিরিয়ার উচ্চভূমি ও উত্তর হিজাজে বসতি স্থাপন করল।[2]

আরবে মুস্তা'রিবা : এঁদের প্রধান পূর্বপুরুষ ইবরাহীম (আঃ) মূলত ইরাকের উর শহরের বাসিন্দা ছিলেন। এ শহরটি ফোরাত বা ইউফ্রেটিস নদীর তীরে কুফার সন্নিকটে অবস্থিত। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ কর্তৃক ঐ শহরটির ভূগর্ভ খননের সময় যে সকল শিলালিপি পুঁথি-পুস্তক ও দলিলাদী উদ্ধার করা হয়েছে তার মাধ্যমে এ শহর সম্পর্কে নানা মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। অধিকন্তু, এ সবের মাধ্যমে ইবরাহীম (আঃ), তাঁর উর্ধ্বতন বংশধরগণ এবং তথাকার বাসিন্দাগণের ধর্মীয়, সামাজিক আচার অনুষ্ঠান এবং অবস্থা সম্পর্কে বহু নতুন নতুন তথ্য উদঘাটিত এবং নব দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আমরা আরও বিলক্ষণ অবগত রয়েছি যে, ইবরাহীম (আঃ) এ স্থান থেকে হিজরত করে হার্রান শহরে আগমন করেছিলেন তারপর সেখানে থেকে তিনি আবার ফিলিস্তীনে গিয়ে উপনীত হন এবং সে দেশকেই তাঁর নবুওয়াতী বা আল্লাহর আহবানজনিত কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেন। আল্লাহ সুবহানাহূ তা'আলা তাঁকে পরম সম্মানিত 'খলিলুল্লাহ' উপাধিতে ভূষিত করে তাঁর উপর রিসালাতের যে সুমহান দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করেছিলেন সেখান থেকেই দেশের অভ্যন্তরভাগে এবং বহির্বিশে ব্যাপক সম্প্রচার এবং প্রসারের জন্য তিনি সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

ইবরাহীম (আঃ) একদা মিশর ভূমিতে গিয়ে উপনীত হন। তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রী সারাহও ছিলেন। মিশরের তৎকালীন বাদশাহ ফেরাউন তাঁর মন্ত্রীর মুখে সারাহর অপরিসীম রূপগুণের কথা শুনে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে স্বীয় যৌন লিপ্সা চরিতার্থ মানসে তাঁর দিকে অগ্রসর হন। এদিকে একরাশ ঘৃণার ক্ষোভানলে বিদগ্ধপ্রাণা সারাহ আবেগকুলচিত্তে আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা জানালে তৎক্ষণাৎ তিনি তা কবূল করেন এবং এর অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি হিসেবে ফেরাউন বিকারগ্রস্ত হয়ে হাত-পা ছোড়াছুঁড়ি করতে থাকেন। অদৃশ্য শক্তিতে শেষ পর্যন্ত তিনি একদম নাজেহাল এবং জর্জরিত হতে থাকেন।

তাঁর এ ঘৃণ্য ও জঘণ্য অসদুদ্দেশ্যের ভয়াবহ পরিণতিতে তিনি একেবারে হতচকিত এবং বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েন। এভাবে অত্যন্ত মর্মান্তিক অবস্থার মধ্য দিয়ে তিনি অনুধাবন করেন যে 'সারাহ' কোন সাধারণ নারী নন, বরং তিনি হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলার উত্তম শ্রেণীভুক্ত এক মহিয়সী মহিলা।

'সারাহর' এ ব্যক্তি-বিশিষ্টতায় তিনি এতই মুগ্ধ এবং অভিভূত হয়ে পড়েন যে তাঁর কন্যা হাজেরাকে[3] সারার খেদমতে সর্বতোভাবে নিয়োজিত করে দেন। হাজেরার সেবা যত্ন ও গুণ-গরিমায় মুগ্ধ হয়ে তারপর তিনি তাঁর স্বামী ইবরাহীম খলিলুল্লাহ (আঃ)-এর সঙ্গে হাজেরার বিবাহ দেন।[4]

ইবরাহীম (আঃ) 'সারাহ' এবং হাজেরাকে সঙ্গে নিয়ে নিজ বাসস্থান ফিলিস্তীন ভূমে প্রত্যাবর্তন করেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা হাজেরার গর্ভে ইবরাহীম (আঃ)-কে পরম ভাগ্যমন্ত এক সন্তান দান করেন। হাজেরার গর্ভে ইবরাহীম (আঃ)-এর ঔরসজাত সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ায় তিনি কিছুটা লজ্জিত এবং বিব্রতবোধ করতে থাকলেন এবং নবজাতকসহ হাজেরাকে নির্বাসনে পাঠানোর জন্য উপর্যুপরি চাপ সৃষ্টি করে চললেন। ফলে তিনি হাজেরা ও নবজাত পুত্র ইসমাঈলকে সঙ্গে নিয়ে হিজায ভূমিতে এসে উপনীত হলেন। তারপর বায়তুল্লাহ শরীফের সন্নিকটে অনাবাদী ও শষ্যহীন উপত্যকায় পরিত্যক্ত অবস্থায় তাঁদের রেখে দিলেন। ঐ সময় বর্তমান আকারে বায়তুল্লাহ

শরীফের কোন অস্তিত্বই ছিল না। বর্তমানে যে স্থানে বায়তুল্লাহ শরীফ অবস্থিত সেই সময় সে স্থানটির আকার ছিল ঠিক একটি উঁচু টিলার মতো। কোন সময় প্লাবনের সৃষ্টি হলে ডান কিংবা বাম দিক দিয়ে সেই প্লাবনের ধারা বয়ে চলে যেত। সেই সময় যমযম কূপের পাশে মসজিদুল হারামের উপরিভাগে বিরাট আকারের একটি বৃক্ষ ছিল। ইবরাহীম (আঃ) স্ত্রী হাজেরা এবং শিশু পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-কে সেই বৃক্ষের নীচে রেখে গেলেন।

সেই সময় এ স্থানে না ছিল কোন জলাশয় বা পানির কোন উৎস, ছিল না কোন লোকালয় বা জনমানব বসতি। একটি পাত্রে কিছু খেজুর এবং একটি ছোট্ট মশকে কিছুটা পানি রেখে ইবরাহীম (আঃ) আবার পাড়ি জমালেন সেই ফিলিস্তিন ভূমে। কিন্তু দিন কয়েকের মধ্যেই ফুরিয়ে গেল খেজুর, ফুরিয়ে গেল পানিও। কঠিন সংকটে নিপতিত হলেন হাজেরা এবং শিশু পুত্র ইসমাঈল। কিন্তু এ ভয়াবহ সংকটেরও সমাধান হয়ে গেল আল্লাহ তা'আলার অসীম মেহেরবানীতে অলৌকিক পন্থায়। সৃষ্টি হল আবে হায়াত যমযম ধারা। ঐ একই ধারায় সংগৃহীত হল দীর্ঘ সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পণ্য সামগ্রী।[5]

কিছুকাল পর ইয়ামান থেকে এক গোত্রের লোকজনেরা সেখানে আগমন করেন। ইসলামের ইতিহাসে এ গোত্রকে 'জুরহুম সানী'' বা 'দ্বিতীয় জুরহুম বলা হয়ে থাকে। এ গোত্র ইসামাঈল (আঃ)-এর মাতার নিকট অনুমতি নিয়ে মক্কাভূমিতে অবস্থান করতে থাকেন। এ কথাও বলা হয়ে থাকে যে প্রথমাবস্থায় এ গোত্র মক্কার আশপাশের পর্বতময় উন্মুক্ত প্রান্তরে বসতি স্থাপন করেছিলেন। সহীহুল বুখারী শরীফে সুস্পষ্টভাবে এতটুকু উল্লেখ আছে যে, মক্কা শরীফে বসবাসের উদ্দেশ্যে তাঁরা আগমন করেছিলেন ইসমাঈল (আঃ)-এর আগমনের পর কিন্তু তাঁর যৌবনে পদার্পণের পূর্বে। অবশ্য তার বহু পূর্ব থেকেই তাঁরা সেই পর্বত পরিবেষ্টিত প্রান্তর দিয়ে যাতায়াত করতেন।[6]

পরিত্যক্ত স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ইবরাহীম (আঃ) সময় সময় মক্কাভূমিতে আগমন করতেন। কিন্তু তিনি কতবার মক্কার পুণ্য ভূমিতে আগমন করেছিলেন তার সঠিক কোন বিবরণ বা হদিস খুঁজে পাওয়া যায় নি। তবে ইতিহাসবিদগণের অভিমত হচ্ছে যে, তিনি চার বার মক্কায় আগমন করেছিলেন, তাঁর এ চার দফা আগমনের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল:

১. কুরআনুল মাজীদে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা স্বপ্নযোগে ইবরাহীম খলিলুল্লাহ (আঃ)-কে দেখালেন যে তিনি আপন পুত্র ইসমাঈল (আঃ) কে কুরবাণী করেছেন। প্রকারান্তরে এ স্বপ্ন ছিল আল্লাহ তা'আলার একটি নির্দেশ এবং পিতাপুত্র উভয়েই একাগ্রচিত্তে সেই নির্দেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন মনে প্রাণে।

(فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلَاء الْمُبِيْنُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ) (سورة صافات ٣٧ : ١٠٣-١٠٧)

'পিতা যখন পুত্রকে কুরবাণী করার উদ্দেশ্যে কপাল-দেশ মাটিতে মিশিয়ে উপুড় করে শুইয়ে দিলেন তখন আল্লাহ তা'আলার বাণী ঘোষিত হল, 'হে ইবরাহীম! তোমার স্বপ্নকে তুমি সর্বতোভাবে সত্যে পরিণত করেছ। অবশ্যই আমি সৎকর্মশীলগণকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চিতরূপে এ ঘটনা ছিল আল্লাহর তরফ থেকে এক মহা অগ্নি পরীক্ষা এবং আল্লাহ তা'আলা বিনিময়ে তাঁদেরকে স্বীয় মনোনীত একটি বড় রকমের প্রাণী দান করেছিলেন।''[7]

'মাজমুআহ' বাইবেলের জন্ম পর্বে উল্লেখ আছে যে, ইসমাঈল (আঃ) ইসহাক্ব (আঃ)-এর চাইতে ১৩ বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং কুরআন শরীফের হিসাব অনুযায়ী ঐ ঘটনা ইসহাক্ব (আঃ)-এর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। কারণ, ইসমাঈল (আঃ)-এর বিস্তারিত বর্ণনার পর ইসহাক্ব (আঃ)-এর জন্ম প্রসঙ্গে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। এ

ঘটনা থেকেই একথা প্রতিপন্ন এবং সাব্যস্ত হয় যে ইসমাঈল (আঃ)-এর যৌবনে উপনীত হওয়ার আগে কমপক্ষে একবার ইবরাহীম (আঃ) মক্কা আগমন করেছিলেন। অবশিষ্ট তিন সফরের বিবরণ সহীহুল বুখারী শরীফের এক দীর্ঘ বর্ণনার মধ্যে পাওয়া যায় যা ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে সরাসরি বর্ণিত হয়েছে।[৪] তার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে নিম্নরূপ :

২. ইসমাঈল (আঃ) যখন যৌবনে পদার্পণ করলেন তখন জুরহুম গোত্রের লোকজনদের নিকট থেকে আরবী ভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করেন এবং সবদিক দিয়েই সংশ্লিষ্ট সকলের শুভ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। এরপর কিছু সময়ের মধ্যেই এ গোত্রের এক মহিলার সঙ্গে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যান। এমন এক অবস্থার মধ্য দিয়ে যখন সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছিল তখন তাঁর নয়নমনি ইসমাঈল (আঃ) কে শোক সাগরে ভাসিয়ে হাজেরা জান্নাতবাসিনী হয়ে যান। (ইন্না লিল্লাহ.....রাজিউন)

এ দিকে পরিত্যক্ত পরিবারের কথা স্মৃতিপটে উদিত হলে ইবরাহীম (আঃ) পুনরায় মক্কা অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। সহধর্মিণী হাজেরা তখন জান্নাতবাসিনী। তিনি প্রথমে গিয়ে উপস্থিত হলেন ইসমাঈল (আঃ)-এর গৃহে। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতির কারণে পিতা-পুত্রের মধ্যে সাক্ষাৎকার আর সম্ভব হল না। দেখা-সাক্ষাৎ এবং কথাবার্তা হল পুত্র বধূর সঙ্গে। আলাপ আলোচনার এক পর্যায়ে পুত্রবধূ সাংসারিক অসচ্ছলতার অভিযোগ অনুযোগ পেশ করলে তিনি এ কথা বলে উপদেশ প্রদান করেন যে, ‘ইসমাঈল (আঃ)-এর আগমনের পর পরই যেন এ দরজার চৌকাঠ পরিবর্তন করে নেয়া হয়’। পিতার উপদেশের তাৎপর্য উপলব্ধি করে ইসমাঈল (আঃ) তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দ্বিতীয় এক মহিলার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এ মহিলা ছিলেন জুরহুম গোত্রের মুযায বিন ‘আমর এর কন্যা।[৫]

৩. ইসমাঈল (আঃ)-এর দ্বিতীয় বিয়ের পর ইবরাহীম (আঃ) পুনরায় মক্কা গমন করেন, কিন্তু এবারও পুত্রের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ সম্ভব হয়নি। পুত্রবধূর নিকট কুশলাদি অবগত হতে চাইলে তিনি আল্লাহ তা‘আলার শুকরিয়া আদায় করেন। এতে সন্তুষ্ট হয়ে ইবরাহীম (আঃ) দরজার চৌকাঠ স্থায়ী রাখার পরামর্শ দেন এবং পুনর্বার ফিলিস্তীন অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন।

৪. এরপর ইবরাহীম (আঃ) আবার মক্কা আগমন করেন তখন ইসমাঈল (আঃ) যমযম কূপের নিকট বৃক্ষের নীচে তীর তৈরি করছিলেন। এমতাবস্থায় হঠাৎ পিতাকে দেখতে পেয়ে তিনি যুগপৎ আবেগ ও আনন্দের আতিশয্যে একেবারে লাফ দিয়ে উঠলেন এবং পিতা ও পুত্র উভয়ে উভয়কে কোলাকুলি ও আলিঙ্গনাবস্থায় বেশ কিছু সময় অতিবাহিত করলেন। এ সাক্ষাৎকার এত দীর্ঘসময় পর সংঘটিত হয়েছিল যে সন্তান-বৎসল, কোমল হৃদয় ও কল্যাণময়ী পিতা এবং পিতৃবৎসল ও অনুগত পুত্রের নিকট তা ছিল অত্যন্ত আবেগময় ও মর্মস্পর্শী। ঐ সময় পিতা পুত্র উভয়ে মিলিতভাবে ক্বাবা’হ গৃহ নির্মাণ করেছিলেন। এ ক্বাবা’হ গৃহের নির্মাণ কাজ পরিসমাপ্তির পর সেখানে পবিত্র হজ্জব্রত পালনের জন্য ইবরাহীম (আঃ) বিশ্ব-মুসলিম গোষ্ঠিকে উদাত্ত আহবান জানালেন।

আল্লাহ তা‘আলা মুযায-এর কন্যার গর্ভে ইসমাঈল (আঃ)-এর ১২টি অথবা ৯টি সুসন্তান দান করেন। তাঁদের নাম হচ্ছে যথাক্রমে- নাবিত্ব বা নাবায়ূত, ক্বায়দার, আদবাঈল, মিবশাম, মিশমা‘, দুমা, মীশা, হাদদ, তাইমা ইয়াতুর, নাফিস, ক্বাইদুমান।

ইসমাঈল (আঃ)-এর ১২টি সন্তান থেকে ১২টি গোত্রের সূত্রপাত হয় এবং সকলেই মক্কা নগরীতে বসতি স্থাপন করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের জীবনযাত্রা ছিল ইয়ামান, মিশর, সিরিয়া প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের

উপর নির্ভরশীল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এ গোত্রগুলো ক্রমান্বয়ে আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং এমন কি আরবের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ তা'আলার অত্যন্ত প্রিয় এবং মনোনীত এক মহাপুরুষের রক্তধারা থেকে এ সকল গোত্রের সৃষ্টি হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা কিন্তু কালচক্রের আবর্তনে সৃষ্ট যবনিকার অন্তরালেই অজ্ঞাত অখ্যাত অবস্থায় থেকে যান। শুধুমাত্র নাবিত্ব এবং ক্বায়দারের বংশধরগণই কালচক্রের আবর্তনে সৃষ্ট গাঢ় তিমির জাল থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে সক্ষম হন। কালক্রমে উত্তর হিজাযে নাবিত্বীদের সাহিত্য ও শিল্প সংস্কৃতির যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়। শুধু তাই নয়, তাঁরা একক শক্তিশালী জাতি এবং বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন, এবং আশপাশের জনগোষ্ঠীগুলোকে তাঁদের অধিনস্থ করে নিয়ে তাঁদের কাছ থেকে নিয়মিত ট্যাক্স বা করও আদায় করতে থাকেন। এঁদের রাজধানী ছিল বাতরা। এঁদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো সৎ সাহস কিংবা শক্তি আশপাশের কারো ছিল না।

তারপর কালচক্রের আবর্তনে রুমীদের অভ্যুদয় ঘটে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁরা এতই উন্নতি সাধন এবং এত বেশী শক্তি সঞ্চয় করে যে তখন নাবিত্বীদের শক্তি-সামর্থ্য এবং শৌর্যবীর্য্যের কথা রূপকথার মতো কল্প কাহিনীতে পর্যবসিত হয়ে যায়। মাওলানা সৈয়দ সুলাইমান নদভী স্বীয় গবেষণা, আলোচনা ও গভীর অনুসন্ধানের পর একথা প্রমাণ করেছেন যে গাসসান বংশধর এবং মদীনার আনসার তথা আওস ও খাজরায গোত্রের কেউই ক্বাহত্বানী আরবের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, বরং ঐ অঞ্চলের মধ্যে নাবিত্ব বিন ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধরগণের যাঁরা অবশিষ্ট ছিলেন কেবল তাঁদেরই অবস্থান আরব ভূমিতে ছিল।[10]

ইমাম বুখারী এ মতরে দিকেই আকৃষ্ট হয়ে তার সহীহুল বুখারীতে নিম্নোক্তভাবে অধ্যায় রচনা করেছেন,

نسبه اليمن إلي اسماعيل عليه السلام

'ইয়ামানীদের সাথে ইসমাঈল (আঃ)-এর সম্পর্ক'। এর সম্পর্কে ইমাম বেশ কিছু হাদীস দ্বারা প্রমাণ দিয়েছেন। হাফেয ইবনু হাজার আসকালানী ক্বাহত্বানীদেরকে নাবিত্ব বিন ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর হওয়ার মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

মক্কা নগরীর পুণ্য ভূমিতেই ক্বায়দার বিন ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশবৃদ্ধি হয় এবং কালক্রমে তাঁরা সেখানে প্রগতির স্বর্ণ-শিখরে আরোহণ করেন। তারপর কালচক্রের আবর্তনে এক সময় তাঁরা অজ্ঞাত অখ্যাত হয়ে পড়েন। তারপর সে স্থানে আদনান এবং তাঁর সন্তানাদির অভ্যূদয় ঘটে। আরবের আদনানীগণের বংশ পরম্পরা সূত্র বিশুদ্ধভাবে এ পর্যন্তই সংরক্ষিত রয়েছে।

আদনান হচ্ছে নাবী কারীম (ﷺ)_এর বংশ তালিকায় ২১ তম উর্ধ্বতন পুরুষ। কোন কোন বর্ণনায় বিবৃত হয়েছে যে নাবী কারীম (ﷺ) যখন নিজ বংশ তালিকা বর্ণনা করতেন তখন আদনান পর্যন্ত গিয়ে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যেতেন, আর একটুও অগ্রসর হতেন না। তিনি বলতেন যে, 'বংশাবলী সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা ভুল বলেছেন।[11] কিন্তু আলেমগণের মধ্যে এক দলের অভিমত হচ্ছে, আদনান হতে আরও উপরে বংশপরম্পরা সূত্র বর্ণনা করা যেতে পারে। নাবী কারীম (ﷺ) এ বর্ণনাকে 'দুর্বল' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর অনুসন্ধান অনুযায়ী আদনান এবং ইবরাহীম (আঃ)-এর মধ্যবর্তী স্থানে দীর্ঘ ৪০টি পিঁড়ির ব্যবধান বিদ্যমান রয়েছে।

যাহোক, মা'আদ্দ এর সন্তান নাযার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি ছাড়া মা'আদ্দের অন্য কোন সন্তান ছিল না। কিন্তু এ নাযার থেকেই আবার কয়েকটি পরিবার অস্তিত্ব লাভ করেছে। প্রকৃতপক্ষে নাযারের ছিল চারটি সন্তান এবং প্রত্যেক সন্তান থেকেই এক একটি গোত্রের গোড়াপত্তন হয়েছিল। নাযারের এ চার সন্তানের নাম ছিল

যথাক্রমে ইয়াদ, আনমার, রাবী'আহ এবং মুযার। এদের মধ্যে রাবী'আহ এবং মুযার গোত্রের শাখা-প্রশাখা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত লাভ করে। অতএব, রাবী'আহ হতে আসাদ ও যুবাই'আহ; আসাদ হতে 'আনযাহ ও জালীদাহ; জালীদাহ হতে অনেক প্রসিদ্ধ গোত্র যেমন- আব্দুল ক্বায়স, নামির, বনু ওয়ায়িল গোত্রের উৎপত্তি; বাকর, তাগলিব বনু ওয়ায়িলের অন্তর্ভুক্ত; বনু বাকর হতে বনু ক্বায়সম বনু শায়বাহন, বুন হানীফাহসহ অন্যান্য গোত্র অস্তিত্ব লাভ করে। আর বনু' আনযাহ হতে বর্তমান সৌদি আরবের বাদশাহী পরিবার আলে সউদ-এর উদ্ভব।

মুযারের সন্তানগণ দুইটি বড় বড় গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সে গোত্র দু'টো হচ্ছে:

(১) ক্বায়স আ'ইলান বিন মুযার, (২) ইলিয়াস বিন মুযার।

ক্বায়স আ'ইলান হতে বনু সুলাইম, বনু হাওয়াযিন, বনু সাক্বীফ, বনু সা'সা'আহ ও বুন গাত্বাফান। গাত্বাফান হতে আ'বস, যুবইয়ান, আশজা' এবং গানি বিন আ'সার গোত্র সমূহের সুত্রপাত হয়।

ইলিয়াস বিন মুযার হতে তামীম বিন মুররাহ, হুযাইল বিন মুদরিকাহ, বনু আসাদ বিন খুযাইমাহ এবং কিনানাহ বিন খুযাইমাহ গোত্রসমূহের উদ্ভব হয়। তারপর কিনানাহ হতে কুরাইশ গোত্রের উদ্ভব হয়। এ গোত্রটি ফেহর বিন মালিক বিন নাযার বিন কিনানাহ এর সন্তানাদি।

তারপর কুরাইশ গোত্র বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়েছে। এর মধ্যে মশহুর শাখাগুলোর নাম হচ্ছে- জুমাহ, সাহম 'আদী, মাখযুম, তাইম, যুহরাহ এবং কুসাই বিন কিলাব এর বংশধরগণ। অর্থাৎ আব্দুদ্দার বিন কুসাই, আসাদ বিন আব্দুল ওযযা এবং আবদে মানাফ এ তিন গোত্রই ছিল কুসাইয়ের সন্তান।

এঁদের মধ্যে আব্দে মানাফের ছিল চার পুত্র এবং চার পুত্র থেকে সৃষ্টি হয় চারটি গোত্রের, অর্থাৎ আব্দে শামস, নওফাল, মোত্তালেব এবং হাশিম। এ হাশিম গোত্র থেকেই আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ) কে নাবী ও রাসূলরূপে মনোনীত করেন।[12]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আঃ)'র সন্তানাদির মধ্য থেকে ইসমাঈল (আঃ) কে, ইসমাঈল (আঃ)-এর সন্তানাদির মধ্যে থেকে কিনানাহকে মনোনীত করেন। কিনানাহর বংশধারার মধ্য থেকে কুরাইশকে, কুরাইশ থেকে বনু হাশিমকে এবং বনু হাশিম থেকে আমাকে মনোনীত করেন।[13]

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেন এবং আমাকে সর্বোত্তম দলভুক্ত করেন। তারপর গোত্রসমূহ নির্বাচন করা হয় এবং এক্ষেত্রেও আমাকে সর্বোত্তম গোত্রের মধ্যে শামিল করা হয়। তারপর পারিবারিক মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করা হয় এবং এক্ষেত্রেও আমাকে অত্যন্ত মর্যাদাশীল পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অতএব, আমি আমার ব্যক্তিসত্তায় যেমন উত্তম, বংশ মর্যাদার ব্যাপারেও তেমনি সব চাইতে উত্তম।[14]

যাহোক, আদনানের বংশধরগণ যখন অধিক সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে লাগলেন তখন জীবিকার অন্বেষণে আরব ভূখন্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। এ প্রেক্ষিতে আব্দুল ক্বায়স গোত্র, বাকর বিন ওয়ায়েলের কয়েকটি শাখা এবং বনু তামীমের বংশধরগণ বাহরায়েন অভিমুখে যাত্রা করেন এবং সেখানে বসতি স্থাপন করে বসবাস করতে থাকেন।

বনু হানীফা বিন সা'ব বিন আলী বিন বাকর গোত্র ইয়ামামা অভিমুখে গমন করেন এবং তার কেন্দ্রস্থল হুজর নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। বাকর বিন ওয়ায়েল গোত্রের অবশিষ্ট শাখাসমূহ ইয়ামামা থেকে বাহরায়েন,

সাইফে কায়েমা, বাহর, সওয়াদে ইরাক, উবুল্লাহ এবং হিত প্রভৃতি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন।

বনু তাগলব গোত্র ফোরাত উপদ্বীপ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে বসবাস করতে থাকেন। অবশ্য তাঁদের কোন শাখা বনু বকরের সঙ্গেও বসবাস করতে থাকেন। এ দিকে বনু তামীম গোত্র বসরার প্রত্যন্ত অঞ্চলকে বসবাসের জন্য উপযুক্ত ভূমি হিসেবে মনোনীত করেন।

বনু সুলাইম গোত্র মদীনার নিকটবর্তী স্থানে বসতি স্থাপন করেন। তাঁদের আবাসস্থল ছিল ওয়াদিউল কুরা হতে আরম্ভ করে খায়বার এবং মদীনার পূর্বদিক দিয়ে অগ্রসর হয়ে হাররায়ে বনু সুলাইমের সাথে মিলিত দুই পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত।

বনু আসাদ তাঁর বসতি স্থাপন করেন তাইমার পূর্বে ও কুফার পশ্চিমে। ওঁদের ও তাইমার মধ্যভাগে বনু ত্বাই গোত্রের এক বোহতার পরিবারের আবাদ ছিল। বনু আসাদের কর্ষিত ভূমি এবং কুফার মধ্যকার পথের দূরত্ব ছিল পাঁচদিনের ব্যবধান।

বনু যুবইয়ার গোত্র বসতি স্থাপন ও আবাদ করতেন তাইমার নিকটে হাওয়ানের আশপাশে।

বনু কিনানাহ গোত্রের লোকজন থেকে যান তেহামায়। এদের মধ্য থেকে কুরাইশগণ বসতি স্থাপন করেন মক্কা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহে। এ সব লোক ছিলেন বিচ্ছিন্ন ধ্যান-ধারণার অধিকারী। তাঁদের মধ্যে কোন নিয়ম শৃঙ্খলা ছিল না। এভাবেই তাদের জীবনধারা চলে আসছিল। তারপর কুসাই বিন কিলাব নামক এক ব্যক্তি তাঁদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং সঠিক পরিচালনাদানের মাধ্যমে তাঁদেরকে প্রচলিত অর্থে মর্যাদা ও সম্মানের আসনে উন্নীত করেন এবং ঐশ্বর্যশালী ও বিজয়ী করেন।[15]

ফুটনোট

[1] ১৯৯৪ সালে লেখক কর্তৃক সম্পাদিত কপিতে জুরহুম, হাযূর, ওয়াবার, ‘আবীল, জাসিম, হাযারামাওত নামগুলো বৃদ্ধি করেছেন। যা পুরাতন কপিতে নেই।

[2] গোত্র সমূহের বিস্তারিত বিবরণাদির জন্য দ্রষ্টব্য আল্লামা খুযরীরঃ ‘মোহাযারাতে তাবীখিল উমামিল ইসলামিয়াহ’ ১ম খন্ড ১১-১৩ পৃঃ এবং ‘কালার জাযীরাতুল আরব’ ২৩১-২৩৫ পৃঃ। দেশত্যাগের ঘটনাবলীর সময় এবং কারণ বির্ধারণের ব্যাপারে ঐতিহাসিক উৎসবের মধ্যে যথেষ্ট মত পার্থক্য রয়েছে। বিভিন্ন দিক আলোচনা পর্যালোচনা করে যা সঠিক বিবেচনা করা হয়েছে তাই এখানে লিপিবদ্ধ হলো।

[3] কথিত আছে যে হাজেরা দাসী ছিলেন কিন্তু আল্লামা সুলাইমান মানসুরপুরী ব্যাপক গবেষণা ও অনুসন্ধান কাজ চালিয়ে সাব্যস্ত করেছেন যে তিনি দাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন ফেরাউনের মেয়ে মুক্ত এবং স্বাধীন। দ্রষ্টব্য রহামাতুল্লিল আলামীন, ২য় খন্ড ৩৬-৩৭ পৃঃ

[4] উলেখিত গ্রন্থের ৩৪ পৃষ্ঠার বিস্তারিত ঘটনা দ্রষ্টব্য সহীহা বুখারী ১ম খন্ড ৪৮৪ পৃ দ্রঃ।

[5] ‘সহীহুল বুখারী শরীফ ১ম খন্ড আম্বিয়া পর্ব, পৃঃ ৪৭৪-৪৭৫।

[6] ‘সহীহুল বুখারী শরীফ ১ম খন্ড আম্বিয়া পর্ব, পৃঃ ৪৭৫।

[7] সূরাহ সাফফাতঃ [(২৩) ১০৩-১০৭]

[8] সহীহুল বুখারী শরীফঃ ১ম খন্ড ৪৭৫-৪৭৬ পৃঃ।

[9] “কালব জাযীরাতুল আরব” ২৩০ পৃঃ।

[10] সৈয়দ সোলাইমান নদভীঃ তারিখে আরযুল কুরআন ২য় খন্ড ৭৮-৮৬ পৃঃ এবং ডঃ এম মজীবুর রহমানঃ মদীনার আনসারঃ পৃঃ ১৩-২৩।

[11] ইবন্ জাবীর তারাবীঃ তারীখূল উমাম ওয়ালি মূলক ১ম খন্ড ১৯১-১৯৪ পৃঃ। ‘আল ই’লাম” ৫ম খন্ড ৬ পৃঃ।

[12] আল্লামা খুযরীঃ মুহাযারাত ১ম খন্ডঃ ১৪-১৫পৃঃ।

[13] সহীহুল মুসলিম শরীফঃ ২য় খন্ডঃ ২৪৫ পৃঃ জামে তিরমিযী ২য় খন্ডঃ ২০১ পৃঃ।

[14] তিরমিযী শরীফ ২য় খন্ডঃ ২০১ পৃঃ।

[15] আল্লামা খুযরী মুহাযারাত ১ম খন্ড ১৫-১৬ পৃঃ।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=5850

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন